বিদ্যাসাগরচরিত

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত

খৃষ্ট

চারিত্রপূজা

বুদ্ধদেব

ভারতপথিক রামমোহন রায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহাত্মা গান্ধী

বিদ্যাসাগরচরিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ - মৃত্যু ২৯ জুলাই ১৮৯১

সূচীপত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর . প্রবেশক

বিদ্যাসাগরচরিত . ৭

বিদ্যাসাগর . ৫৩

সংযোজন

বিদ্যাসাগর . ৬৯

বিদ্যাসাগরস্মৃতি . ৮১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদসিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥

২৪ ভাদ্র
১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগরচরিত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া— হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে— করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়— যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন

সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া, ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর

বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য-কুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমাণ, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো— তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজান-মুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই

সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতা-গুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্য বিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা

প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।— অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও

অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্ব-প্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যা-সাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্র-জ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন— অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্ম-নির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির

অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়— আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত— কিন্তু ইহা দেখা যায় সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে

পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া, দুই পুত্র ও চারি কন্যা -সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্ক-ভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন ; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।[১]

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।—

তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত

এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি, সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।[১]

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তুবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারো অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে।[২]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি

ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।[১]

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যু-ভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন-কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।—

ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।[১]

অবশেষে শোণিতস্রুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন ; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।" বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এ হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্‌ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই,

কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারদের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্‌-সরকারের বাড়ি ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব এক-খানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল— অজানিত

লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[২]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—

বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন. এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া. কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত. কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত

অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মহিয়ানা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতীদেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভববতী-দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত

নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়— এবং ইহাও বুঝিতে পারি ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতীদেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?"[২]

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র

বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতীদেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা -সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে এক-দিন পূজা করিয়া ছয়-সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে? অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথা-ভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনী-পুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতীদেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

জননীদেবী সাহেবের ভোজন-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।··· সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয় কি পুরুষ কি স্ত্রী কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে একারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।[২]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন; আর এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননীজঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে. বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎনারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমা-

পূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্য ভক্ত -কর্তৃক তাঁহার চরিতকীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্‌, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যে দিন শাদা বস্ত্র না থাকিত, সে দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যে দিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাকশালের ঘাটে নাবাইয়া দিলেও

দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।[২]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও

নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড— স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশে কশুরে জৈ বলিয়া খেপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।[২]

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন— রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার

বর্ণনা করিয়াছেন ।প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

> দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।[২]

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল

অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন; কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য-শালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃতকলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি -ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা

করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্ কার-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া, বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণ-যুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কী করিয়া। তিনি বলিলেন, “আলু-পটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।” তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না।

তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর ক্যাপ্তেন ব্যাঙ্ক্‌-নামক একজন ইংরাজকে কয়েক মাস বাংলা ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট-সাহেব আমার বন্ধু— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল্‌-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যা-সাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহত-ভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে

কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্যসংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই?"[২] মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি

স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে।—

" রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যান্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্ত্রীজাতির স্নেহ দয়া সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র-হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত

হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ক-কলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্তদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি -মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষল-

ধারে শাস্ত্র ও গালি -বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধি-সম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীন-দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্প-কোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া, ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালিহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদাই বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন

তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসা-পত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।[২] পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্ম-কালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস-নিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্‌ ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না

আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই-মাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়-নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।[২]

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলসশান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া

যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম -লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো-এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টি-সংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়-পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজে 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ— পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক

ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত, তাহারা পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন।

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে। কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া, আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহা-দিগকে ভালোমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি,

সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তিপ্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত করি।—

বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বর-চন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়

উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো, অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ড-জ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ

আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে, দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরি-শৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে— তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে,

প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন — ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের ; তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব -প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহ গ্রন্থে

আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।—

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! ....অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ।

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যা-

সাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সে'ই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যা-সাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সে'ও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগ-পূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ

পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, "এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।"... ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কী মানেন?"

বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থ-ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মান-রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যা-

সাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননীদেবী চরকাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।"[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব তদানীন্তন লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্নর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা

আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না ; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না ; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না ; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না ; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া

আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন ; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন ; কিন্তু আমাদের শত-সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যা-সাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি ; এই বৃহৎ

পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

১ স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত

২ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন -প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

বিদ্যাসাগর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে'ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্য-সকলকে একতন্ত্রে নিয়মিত করে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিন্ন হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতশ্চালিত এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইরূপ মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে, সেই মনন-দ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।

কোনো মনস্বী ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, 'এমন লোকটি পাওয়া দুর্লভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, যিনি নিজের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন, কর্মস্রোতকে *প্রবাহিত* এবং *প্রতিহত* করিবার মতো বল যাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে ঊর্ধ্বে রাখিতে পারেন এবং সেই জনতাপ্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি, তৎসম্বন্ধে যাঁহার একটি পরিষ্কৃত সংস্কার আছে।'

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দুর্লভ 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'।

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া ভ্রম হয় তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে। কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গগুলি অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া — তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।

জলের মধ্যে তৃণ যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া ভাসে না। জলের পথ এবং মাছের পথ সর্বদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অনুসরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে হয়, তৃণ সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়া-দ্বারা যে মন জীবিত তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রভেদ শাস্ত্রীমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটিমাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণজীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি ; তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলা ছিল, কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ-লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ-লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহির্জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া পরা শোওয়া, কাজকর্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহির্জীবনের মূলগ্রন্থি।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম মহল ও খাস মহলের দুই কর্তা— স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া চলাই মানব-

জীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলীযন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি; চিন্তা করি না, কর্ম করি; বোধ করি না, অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ, তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়-প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নির্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর-একজনের মতো এবং এক কালের সহিত অন্য কালের বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ।' অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা যায় না। গতানুগতিক

লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতানুগতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও বিচিত্র কর্মের চাঞ্চল্য সর্বদা বর্তমান সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে— যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে।

তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মূঢ়তাকে কিরূপ সুতীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

কার্লাইল যাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে।

The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most under the Temporary, Trivial : his being is in That ; he declares that abroad, by act or speech as it may be, in declaring himself abroad.

অর্থাৎ, তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন— যে সত্য দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারি দিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের

অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব; কর্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।

কার্লাইলের মতে ইঁহারা কাপড় ঝুলাইবার আলনা বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ইঁহারাই সজীব মনুষ্য, অর্থাৎ সেই একই কথা, 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। অথবা, অন্য কবির ভাষায় ইঁহারা গতানুগতিকমাত্র নহেন ইঁহারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে যেমন সহজে এবং সুতীব্রভাবে অনুভব করি, মননজীবিগণ পরমার্থকে ঠিক তেমনি সহজে অনুভব করেন এবং তাহার দ্বারা তেমনি অনায়াসে চালিত হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাঁহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দামৃতে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্বই নাই।

পৃথিবীর এমন একদিন ছিল যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিণ্ড লইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্যে তাহার স্থলজল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু

এখনো সর্বত্র যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন চারি দিকের সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে বহুকাল গুমটের পর হঠাৎ একদিন ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক ঝড়ের বেগ আমাদিগকে স্বার্থ ও সুবিধা লঙ্ঘন করিয়া আরাম ও অভ্যাসের বাহিরে ক্ষণকালের জন্য আকর্ষণ করে, কিন্তু সে-সকল দমকা হাওয়া চলিয়া গেলে সে কথা আর মনেও থাকে না; আবার সেই আহারবিহার আমোদপ্রমোদের নিত্যচক্রের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করি।

ইহার কারণ, মনোজীবন আমাদের মধ্যে পরিণতিলাভ করে নাই— আগাগোড়া বাঁধিয়া যায় নাই। চেতনা ও বেদনার আভাস সে অনুভব করে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব নাই। অনুভূতি হইতে কার্যসম্পাদন পর্যন্ত অবিচ্ছেদ যোগ ও অনিবার্য বেগ থাকে না। কাজের সহিত ভাবের ও ভাবের সহিত মনের সচেতন নাড়ীজালের সজীব বন্ধন স্থাপিত হয় নাই।

যাঁহাদের মধ্যে সেই বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহারা সেই দ্বিতীয় জীবন লাভ করিয়াছেন, পরমার্থদ্বারা শেষ পর্যন্ত চালিত না হইয়া তাঁহাদের থাকিবার জো নাই। তাঁহাদের একটা

দ্বিতীয় চেতনা আছে—সে চেতনার সমস্ত বেদনা আমাদের অনুভবের অতীত।

বিদ্যাসাগর সেই দ্বিতীয় চেতনা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার বেদনার অন্ত ছিল না। চারি দিকের অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশালহৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী আপন কাজ করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণলোকের হিসাবে সে-সমস্ত কাজের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যে এবং বিদ্যালয়পাঠ্যগ্রন্থ-বিক্রয়-দ্বারা ধনোপার্জনে সংসারে যথেষ্ট সম্মানপ্রতিপত্তি লাভ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের হিসাবে এ-সমস্ত কাজের একান্ত প্রয়োজন ছিল; নতুবা তিনি যে অধিকজীবন বহন করিতেন সে জীবনের নিশ্বাসরোধ হইত; তাঁহার ধনোপার্জন ও সম্মানলাভে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।

বালবিধবার দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে একটি ক্ষণিক ভাবোদ্রেক মাত্র। তাহাদের বেদনা আমাদের জীবনকে স্পর্শ করে না। কারণ, আমরা গতানুগতিক; যেখানে দশজনের বেদনাবোধ নাই সেখানে আমরা অচেতন। আমরা প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষরূপে অব্যবহিতরূপে তাহাদের বঞ্চিতজীবনের সমস্ত দুঃখ ও অবমাননাকে আপনার দুঃখ ও অবমাননা -রূপে অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আপন অতি-

চেতনার দণ্ড বহন করিতে হইয়াছিল। অভ্যাস লোকাচার ও অসাড়তার পাষাণব্যবধান আশ্রয় করিয়া পরের দুঃখ হইতে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমরা যেমন ব্যাকুলভাবে আপনার দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাণপণে, দ্বিগুণতর প্রতিজ্ঞা -সহকারে, বিধবাগণকে অতলস্পর্শ অচেতন নিষ্ঠুরতা হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষে স্বার্থ যেমন প্রবল, পরমার্থ তাঁহার পক্ষে ততোধিক প্রবল ছিল।

এমন একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবনের সকল কার্যেই দেখা গিয়াছে, তিনি যে চেতনারাজ্যে, যে মননলোকে বাস করিতেন, আমরা তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও বেদনা গতানুগতিকের মতো ছিল না, তাহা পারমাথিক ছিল।

তাঁহার মতো লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়া-ছিলেন বলিয়া, চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারম্বার আহত প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসংকুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিত ক্ষুব্ধ ভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারো সাড়াও পান নাই,

অথচ বাধা ছিল পদে পদে। তাঁহার মননজীবী অন্তঃকরণ তাঁহাকে প্রবল আবেগে কাজ করাইয়াছিল, কিন্তু গতজীবন বহিঃসংসার তাঁহাকে আশ্বাস দেয় নাই। তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে।

আধুনিক ইংলণ্ডে বিদ্যাসাগরের ঠিক উপমা পাওয়া যায় না। কেবল জন্‌সনের সহিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সে সাদৃশ্য বাহিরের কাজে ততটা নয়— কারণ, কাজে বিদ্যাসাগর জন্‌সন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন; কিন্তু এই সাদৃশ্য অন্তরের সরল প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জন্‌সনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্‌সনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুর্বিষহ দারিদ্র্যও মুহূর্ত-কালের জন্য তাঁহার আত্মসম্মান আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সুবিখ্যাত ইংরাজিলেখক লেস্‌লি স্টীফ্‌ন্, জন্‌সন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

মতের পরিবর্তে কেবল কথামাত্রদ্বারা তাঁহাকে ভুলাইবার জো ছিল না, এবং তিনি এমন কোনো মতবাদও গ্রাহ্য করিতেন না যাহা অকৃত্রিম আবেগ-উৎপাদনে অক্ষম। ইহা ব্যতীত তাঁহার হৃদয়বৃত্তিসকল যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর এবং সুকোমল ছিল। তাঁহার বৃদ্ধা এবং কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কী পবিত্র ছিল। যেখানে কিছুমাত্র

উপকারে লাগিত সেখানে তাঁহার করুণা কিরূপ সবেগে অগ্রসর হইত, 'গ্রাব্‌স্ট্রীট'এর সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে তিনি কিরূপ পুরুষোচিত আত্মসম্মানের সহিত আপন সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন, সে-সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বোধ করি, এ-সকল গুণের একান্ত দুর্লভতা সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা ভালো। বোধ হয় অনেকেই আপন পিতাকে ভালোবাসে সৌভাগ্যক্রমে তাহা সত্য; কিন্তু ক'টা লোক আছে যাহার পিতৃভক্তি খ্যাপামি-অপবাদের আশঙ্কা অতিক্রম করিতে পারে। কয়জন আছেন যাঁহারা বহুদিনগত এক অবাধ্যতা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তসাধনের জন্য য়ুটক্‌সিটারের হাটে পিতার মৃত্যুর বহু বৎসর পরেও যাত্রা করিতে পারেন। সমাজত্যক্তা রমণী পথপ্রান্তে নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়া আছে দেখিলে আমাদের অনেকেরই মনে ক্ষণিক দয়ার আবেশ হয়। আমরা হয়তো পুলিসকে ডাকি কিম্বা ঠিকাগাড়িতে চড়াইয়া দিয়া তাহাকে সরকারি দরিদ্রাশ্রমে পাঠাই, অথবা বড়োজোর সরকারি দরিদ্রপালন ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে টাইম্‌স্-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই! কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি জিজ্ঞাসা না করাই ভালো যে, কয়জন সাধু আছেন যাঁহারা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া যাইতে পারেন এবং তাহার অভাব-সকল মোচন করিয়া দিয়া তাহার জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। অনেক বড়োলোকের জীবনে আমরা সাধুভাব ও সদাচার দেখিতে পাই, কিন্তু ভালো লোকের মধ্যেও এমন আদর্শ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার জীবন প্রচলিত লোকাচারের দ্বারা গঠিত নহে অথবা যাঁহার হৃদয়বৃত্তি চিরাভ্যস্ত শিষ্ট-প্রথার বাঁধা খাল উদ্‌বেল করিয়া উঠিতে পারে। জন্‌সনের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে প্রীতি জন্মে তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার জীবন যে

নেমি আশ্রয় করিয়া আবর্তিত হইত তাহা মহত্ত্ব, তাহা প্রথামাত্রের দাসত্ব নহে ।··· অ্যাডিসন দেখাইয়াছিলেন খৃস্টানের মরণ কিরূপ ; কিন্তু তাঁহার জীবন আরামের অবস্থা ও স্টেট্‌-সেক্রেটারির পদ এবং কাউন্টেসের সহিত বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল ; মাঝে মাঝে পোর্ট্‌মদিরার অতিসেবন ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ী ও তাঁহার মেজাজকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু আর-একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী, যিনি অন্তর এবং বাহিরের দুঃখ-রাশি সত্ত্বেও যুদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহসিত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যিনি নৈরাশ্যদৈত্যের বন্ধন হইতে বহু চেষ্টায়, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমাদের মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই এই লোকের অন্তিমকালের হৃদয়বৃত্তি কিরূপ কোমল, গম্ভীর এবং সরল, তখন আমরা স্বতই অনুভব করি যে, যে নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা উন্নততর সত্তার সন্নিধানে বর্তমান আছি।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্‌সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অভ্যস্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই ; তাঁহারও স্নেহ ভক্তি দয়া, তাঁহার বিপুলবিস্তীর্ণ হৃদয়, সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে ব্যক্ত হইত তাহা তাঁহার জীবনচরিতের নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্‌সন সম্বন্ধে কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।—

তিনি প্রবল এবং মহৎ লোক ছিলেন। শেষ পর্যন্তই অনেক জিনিস তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল; অনুকূল উপকরণের মধ্যে তিনি কী না হইতে পারিতেন— কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের 'উপকরণ', নিজের 'কাল' এবং ঐগুলা লইয়া নালিশ করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই; উহা একটা নিষ্ফল আক্ষেপমাত্র। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালোই; তিনি সেটাকে আরো ভালো করিবার জন্যই আসিয়াছেন। জন্‌সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক্; কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুকূলতম হইলেও জন্‌সনের জীবন দুঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগাতুর দুঃখরাশির মধ্যে বাস করো। না, বোধ করি দুঃখ এবং মহত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে, এমন-কি অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হউক, অভাগা জন্‌সনকে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কল্পনা করিয়া দেখো— তাঁহার সেই রুগ্‌ণ শরীর, তাঁহার ক্ষুধিত প্রকাণ্ড হৃদয় এবং অনির্বচনীয় উদ্‌বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ লইয়া পৃথিবীতে বিপদাকীর্ণ বিদেশীর মতো ফিরিতেছেন, ব্যগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোনো পারমার্থিক পদার্থ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছুই না পান তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত্র ব্যাকরণের ব্যাপার! সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে বিপুলতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল তাঁহারই ছিল, অথচ তাঁহার জন্য

বরাদ্দ ছিল সাড়ে-চার আনা করিয়া প্রতিদিন। তবু সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়! অক্সফোর্ডে তাঁহার সেই জুতাজোড়ার গল্পটা সর্বদাই মনে পড়ে; মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই দাগকাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা কলেজের দীন ছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জুতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাঁহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল, এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট দৃষ্টির নিকট ধরিল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দূর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভিজা পা বলো, পঙ্ক বলো, বরফ বলো, ক্ষুধা বলো, সবই সহ্য হয়, কিন্তু ভিক্ষা নহে; আমরা ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না। এখানে কেবল রূঢ় সুদৃঢ় আত্মসহায়তা। দৈন্যমালিন্য, উদ্‌ভ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ত্ব এবং পৌরুষ! এই-যে জুতা ছুঁড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মানুষটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীয়তন্ত্র (original) মানুষ, এ তোমার গতানুগতিক ঋণপ্রার্থী ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর যাই হউক, আমরা আমাদের নিজের ভিত্তির উপরেই যেন স্থিতি করি— সেই জুতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ানো যাক যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনিই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চলিব, বরফের উপরেই চলিব, কিন্তু উন্নতভাবে চলিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন তাহারই উপর চলিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন তাহারই নকলের উপর চলিব না।

কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার ঘটনা সম্বন্ধে না মিলুক, তাহার মর্মকথাটুকু বিদ্যাসাগরে অবিকল খাটে। তিনি গতানু-

গতিক ছিলেন না ; তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না ; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা সরলতা গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

—

বিদ্যাসাগর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয়, কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।— এমন

দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায়, সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু চারিত্রবল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্রবল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধিগত, সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্রবল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না। মানসিক চারিত্রবলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগরমহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব চেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্

দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস। যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানব-জীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে, সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে, তাদের ধর্ম কর্ম বিষয়ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে; তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে জিনিসটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষগোচর হয়, এমন-কি, আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে— সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা

করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকলপ্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনোরকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেই-জন্যেই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে ; কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে, তিনি কত বড়ো সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারি নে। কারণ, সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে

যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড়ো রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশ-লাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতবিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে দেন। কিন্তু বাধাই যে দেশের দেবতা সে দেশ এই মহা-পুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন তা হলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যাঁরা বড়ো, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করবার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

এ কথা মানতেই হবে যে, বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়ে-ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন;

তার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড়ো তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে— অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষে আর-এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন; এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য

মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব করতে পারি না যে, এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত উর্ধ্বে বিরাজ করেন। যারা ছোটো, বড়োর বড়োত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড়ো অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটোর আঘাতই বড়োর পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্যে তার স্বকীয় উদ্‌ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ, বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত, যা অলব্ধ, তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে; সে জাতি শিল্পে

সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন-দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা'কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু

নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয়, যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। এক দিকে আমরা ভাবী কালে সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে পারছি না, অন্য দিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা এক দিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্যসহচর করেছি; আবার অন্য দিকে বলছি যে, বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে, না পিছে—কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করতে উদ্যমশীল হয়েছেন, তাঁরাই চিরস্মরণীয়, কারণ তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথ-

প্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মতো লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্যবিদ্যার যে সম্মান করছি তা কতকটা দেশাভিমান-বশত। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা-বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি, কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হই নি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগরমহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন; তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহক রূপে দেখেন নি। তিনি কত কালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত

করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে, এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যেদিন 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাঁরা প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের বলব, 'ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয় নি; তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।'

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে ভাবী কালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বলতে পারব, সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

ভাদ্র ১৩২৯

যে সযত্নস্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ বারংবার উপস্থিত হয়; যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্যকর্মের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।

যে-সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভদৈবক্রমে দেশ লাভ করে সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণবান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদিপরিচয়কে ক্রমে অনতিগোচর করে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন করে ঘটাতে থাকে যাতে করে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্কে গণ্য করাই যায় না।

সেইজন্যেই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ করে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা করে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথ-খননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে ; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহন-রূপে রসসৃষ্টিতে ; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যা-সাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে; সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলাভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃতভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলাভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত

হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারে নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলাভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনিহিল্লোলের প্রতি লক্ষ রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলাভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গির অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তা-রূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্য-কৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই-যে মন্দিরের

প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ, এইসঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এখনো আমার সম্মাননিবেদন সম্পূর্ণ হয় নি। সবশেষের কথা উপসংহারে বলতে চাই। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন। সেই স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধতাকে একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচে নিঃশব্দে অতিক্রম করে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে

ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনি যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজশাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীনদুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশি কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়— তাঁর বীরত্ব। তাই কামনা করি আজ তাঁর যে কীর্তিকে লক্ষ্য করে এই স্মৃতিসদনের দ্বার উন্মোচন করা হল, তার মধ্যে সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক্ তাঁর মহাপুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি। ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

পৌষ ১৩৪৬

—

গ্রন্থমধ্যে প্রত্যেক প্রবন্ধ-শেষে উহার প্রথম প্রকাশকাল মুদ্রিত। পরে বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিদ্যাসাগরচরিত প্রবন্ধটি ১৩০২ সালের '১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এমারল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত' ও ১৩০২ সালের সাধনা পত্রের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালের ভারতী পত্রের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

অতঃপর উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। পরে এই দুইটি প্রবন্ধ লইয়া 'বিদ্যাসাগরচরিত' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রণকাল জানা যায় না; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ '১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ইহা সর্ব্বপ্রথম পুস্তিকাকারে ।০ আনা মূল্যে প্রকাশ করেন।' দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণ যথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। বর্তমান পুস্তক উহারই পরিবর্ধিত সংস্করণ।

চারিত্রপূজা বা প্রথম-প্রকাশিত বিদ্যাসাগরচরিত এই দুখানি গ্রন্থের সংকলনের অতিরিক্ত, বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে অন্য নূতন দুইটি প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থের সংযোজন-অংশে সন্নিবেশিত হইল। তন্মধ্যে 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি, কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে 'বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় বক্তৃতার মর্ম', প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত। রচনাটি ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে ও নব্যভারতে মুদ্রিত হয়, ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত

হইয়াছে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্গত হয় নাই।

'বিদ্যাসাগরস্মৃতি' প্রবন্ধটি মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির-প্রবেশ-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত হয় ১৩৪৬ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ তারিখে। তদুপলক্ষে ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।[১] ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে ও অন্য কোনো কোনো সাময়িক পত্রেও পুনর্মুদ্রিত হয়, এখন গ্রন্থভুক্ত হইল।

গ্রন্থসূচনায় যে কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা উক্ত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে রচিত ও প্রেরিত। উহা ১৩৪৫ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে ও অন্য কোনো কোনো সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়, বর্তমানে গ্রন্থভুক্ত হইল। বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দিরের প্রবেশ-উৎসব উপলক্ষে যে কার্যসূচী-সংবলিত আমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হয়, কবির হস্তলিপি তাহা হইতে গৃহীত।

১৩০৫ অগ্রহায়ণের 'ভারতী' (পৃ. ৭৪২-৪৩) হইতে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধের বর্জিত সূচনাংশ এখানে সংকলনযোগ্য।—

আশ্বিন-কার্তিকের প্রদীপে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' -নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠমাত্র করিয়া সংক্ষেপে বিদায় করিবার জিনিস নহে। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল চিন্তা

১ বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির। প্রবেশ-উৎসব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী। মেদিনীপুর। ৩০ পৌষ [অগ্রহায়ণ], ১৩৪৬

ফলাইয়া তুলিয়াছেন তাহা প্রাণবান বীজের মতো পড়িয়া পাঠকহৃদয়ে আপনাকে নবজীবনে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কোনো নূতন কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হই নাই। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথাকেই আমরা নিজের মতো করিয়া ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা তাঁহারই প্রবন্ধটিকে সাদরে লালন করিতেছি। ভাল লেখা বাঙালী পাঠকসমাজে ভূমিষ্ঠ হইয়া কেবল ঔদাসীন্যের বিষবায়ুতে দুই দিনেই মারা যায়; সাহিত্যরাজ্যের এই মহামারী নিবারণের একমাত্র উপায় শ্রদ্ধা।

—